খাদ্য, পুষ্টি ও খাদ্যের উপাদান

ইউনিট ৯

ভূমিকা

জীবদেহের জীবনধারণ তথা বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। জীবজগতের অন্যান্য জীবের মতোই মানবদেহের জীবনধারণ, গঠন, বৃদ্ধি, তাপ উৎপাদন, কর্মক্ষমতা প্রদান, সুস্থতা রক্ষা প্রভৃতি কাজের জন্য খাদ্য প্রয়োজন হয়। খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে পুষ্টি সাধন হয়। আমরা বড় হই, চলাফেরা করতে পারি, কর্মক্ষম ও সুস্থ-সবল থাকতে পারি। তবে একই খাদ্য সব ধরনের কাজ সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণভাবে করতে পারে না। একেক ধরনের খাদ্য একেক ধরনের কাজ করে থাকে। রাসায়নিক গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী খাদ্য উপাদান ৬ প্রকার। এগুলো হলো– ১। প্রোটিন বা আমিষ, ২। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা, ৩। ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ, ৪। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, ৫। মিনারেল বা খনিজ লবণ বা ধাতব লবণ এবং ৬। পানি। এসব খাদ্য উপাদানসমূহ সম্মিলিতভাবে কাজ করে দেহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে। খাদ্য উপাদানসমূহ মূলত কতগুলো জৈব বা অজৈব যৌগের সমন্বয়ে গঠিত। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মৌল দিয়ে গঠিত হয় এমাইনো এসিড। এক বা একাধিক এমাইনো এসিড সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন অণু গঠিত হয়। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হলো শর্করা অণুর গঠন একক। ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল সমন্বয়ে ফ্যাট গঠিত হয়। ভিটামিন প্রধানত জৈব এবং খনিজ লবণ হলো অজৈব খনিজ পদার্থ। পানির গঠন উপাদান হল– হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এসব খাদ্য উপাদানের দেহে অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। খাদ্যে এদের দীর্ঘদিনের ঘাটতিতে নানাবিধ রোগ সৃষ্টিসহ মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি
পাঠ-৯.২ : প্রোটিন বা আমিষ
পাঠ-৯.৩ : কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা
পাঠ-৯.৪ : ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ

পাঠ-৯.১ সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- খাদ্য বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- খাদ্য উপাদানসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- মানবদেহে খাদ্যের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- পুষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

জীব জগতের সবচেয়ে চরম সত্য হলো- ক্ষুধা। মাতৃগর্ভ হতেই শিশু ক্ষুধা অনুভব করতে পারে এবং মৃত্যু পর্যন্ত মানবসন্তানের এ অনুভূতি জাগ্রত থাকে। আর খাদ্য গ্রহণ করেই আমরা ক্ষুধা নিবৃত্ত করি। খাদ্য জীবন রক্ষার অপরিহার্য অংশ।

খাদ্য

যেসব দ্রব্য আহারের পর দেহে পরিপাক ও শোষিত হয়ে গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে দেহকে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম ও রোগমুক্ত রাখে সেসবই খাদ্য। সাধারণভাবে খাদ্যকে ক্ষুধা নিবারক মনে হলেও খাদ্য আসলে মানবদেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

খাদ্য উপাদান

আমরা জীবনে অসংখ্য ধরনের খাদ্য খেয়ে থাকি। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, ঘনত্ব, প্রকৃতি ইত্যাদির দিক থেকে খাদ্য বিভিন্ন রকম হয়। খাদ্যের রাসায়নিক প্রকৃতি ও গঠনের বিভিন্নতা অনুসারে খাদ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে খাদ্য উপাদান বলা হয়। খাদ্য উপাদান ৬টি। যথা:

১। প্রোটিন (Protein) বা আমিষ
২। কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) বা শর্করা
৩। ফ্যাট (Fat) বা স্নেহ পদার্থ
৪। ভিটামিন (Vitamin) বা খাদ্যপ্রাণ
৫। মিনারেল (Mineral) বা খনিজ লবণ বা ধাতব লবণ
৬। পানি (Water)

খাদ্যের কাজ

মানবদেহের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। খাদ্য দেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কাজ করে থাকে। এগুলো হলো–

১। **দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ:** মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির পর হতে ২০/২৫ বছর বয়স পর্যন্ত আমাদের দেহ গঠন ও বৃদ্ধিসাধন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এছাড়া কায়িক শ্রম, রোগ-বালাই, ইত্যাদিতে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। খাদ্য মানব দেহে এসব গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করে থাকে। যেমন- দেহের পেশি গঠনে প্রোটিন ও অস্থি বা হাড় গঠনে ক্যালসিয়াম কাজ করে।

২। **তাপ ও শক্তি উৎপাদন:** দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় রাখা ও অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পাদন করে দেহকে সচল রাখার জন্য খাদ্য তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয় বলেই আমরা সচল ও সক্রিয় থাকতে পারি। স্নেহ জাতীয় খাদ্য হতে দেহে সর্বাধিক তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। শর্করা জাতীয় খাদ্য হতে উৎপন্ন শক্তিও দেহে অতি

প্রয়োজনীয়। ১ গ্রাম শর্করা হতে ৪ কিলোক্যালরি (প্রায়), ১ গ্রাম প্রোটিন হতে ৪ কিলোক্যালরি (প্রায়) এবং ১ গ্রাম ফ্যাট হতে ৯ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়।

৩। **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিঃ** খাদ্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে দেহকে জীবাণু ও রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা করে। প্রধানত ভিটামিন ও খনিজ লবণ জাতীয় খাদ্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে দেহকে সুস্থ রাখে।

৪। **দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণঃ** মানবদেহে প্রতিনিয়ত অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক কর্মক্রিয়া চলতে থাকে। হৃৎপিন্ড (Heart), ফুসফুস (Lung), পাকস্থলী (Stomatch), মস্তিষ্ক (Brain), বৃক্ক (Kidney), যকৃত (Liver) ইত্যাদি সবসময় সক্রিয় অবস্থায় থাকে। এনজাইম ও হরমোনসমূহ শরীরের অভ্যন্তরীণ জৈব রাসায়নিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া বিপাক, পরিপাক, শোষণ ইত্যাদি কাজ সংঘটিত হয়। এসব কাজে প্রোটিন, খনিজ লবণ, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, পানি ইত্যাদি বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে।

কাজ অনুযায়ী খাদ্যের ভাগ

দেহে খাদ্যের কাজ অনুযায়ী খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো–

১। **দেহ গঠন ও ক্ষয়পূরণকারী খাদ্যঃ** প্রধানত আমিষ জাতীয় খাদ্য।

২। **তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্যঃ** প্রধানত স্নেহ ও শর্করা জাতীয় খাদ্য।

৩। **রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্যঃ** প্রধানত ভিটামিন ও খনিজ লবণ জাতীয় খাদ্য।

প্রধান খাদ্য ও অণুখাদ্য (Macronutrients and Micronutrients): দেহে গৃহীত খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণের উপর নির্ভর করে খাদ্যকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১। **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা প্রধান খাদ্যঃ** যেসব খাদ্য আমাদের দেহে অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা প্রধান খাদ্য বলে। যেমন- আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য। এসব খাদ্য দেহে জারিত হয়ে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।

২। **মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুখাদ্যঃ** যেসব খাদ্য আমাদের দেহে অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুখাদ্য বলে। এসব খাদ্যের অভাবে দেহে অভাবজনিত লক্ষণাদি প্রকাশ পায় ও দীর্ঘদিনের ঘাটতিতে জটিল শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। যথা- ভিটামিন ও খনিজ লবণ জাতীয় খাদ্য। ভিটামিন ও খনিজ লবণ হতে তাপ ও শক্তি পাওয়া যায় না, তবে দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ায় এদের উপস্থিতি অপরিহার্য।

পুষ্টি (Nutrition)

আমরা যেসব খাদ্যদ্রব্য আহার করি সেসব দেহে সরাসরি শোষিত হতে বা কাজে লাগতে পারে না। দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী শোষিত হওয়ার জন্য পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যকে শোষণ উপযোগী সরল অণুতে পরিণত হতে হয়। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহারকৃত খাদ্যের জটিল ও বৃহৎ অণুগুলো পরিপাক হয়ে সরল অণুতে পরিণত হয়ে দেহকোষে শোষিত হয় এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ দেহ হতে নির্গত হয়ে যায় তাকে পুষ্টি প্রক্রিয়া বলে। এক কথায়, পুষ্টি হলো একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আহারকৃত খাদ্যবস্তু দেহের কাজের ব্যবহৃত হয়। পুষ্টি প্রক্রিয়া চলতে থাকে বলেই গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ কার্যাদি সম্পাদন করে দেহ সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম ও রোগমুক্ত থাকে।

অপুষ্টি (Malnutrition)

আমরা জানি যে, একেক ধরনের খাদ্য দেহে একেক ধরনের কাজ করে থাকে। এদের যেকোনোটির অভাবেই দেহে অপুষ্টি দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে, প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বা অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। পুষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার ফলেই দেহে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। একে অপুষ্টি বলে। সাধারণ অর্থে আমরা খাদ্য উপাদানের অপর্যাপ্ততার কারণে সৃষ্ট অভাবজনিত শারীরিক অবস্থাকে অপুষ্টি বলে চিহ্নিত করে থাকি। তবে, অপুষ্টি দু'ধরনের হতে পারে। ১। কমপুষ্টি (Under nutrition) ২। অতিপুষ্টি (Over nutrition)।

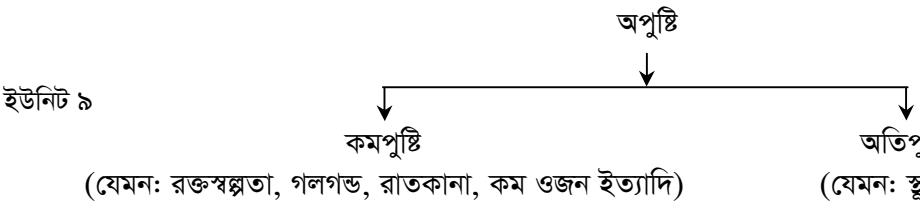

খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষার গুরুত্ব

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য একটি অনিবার্য বিষয়। অথচ বিশ্বের অনুন্নত, স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে খাদ্যাভাবে সৃষ্ট পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টি একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইদানীংকালে আমাদের দেশে পর্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হওয়ায় খাদ্যাভাব অনেকাংশেই দূর হয়েছে। তবে শুধু দারিদ্র বা খাদ্যাভাবই নয় বরং পুষ্টিজ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে জনগণ অপুষ্টির শিকার হয়। রাতকানা, গলগন্ড, এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা, ঠোঁটের কোণায় ঘা, চর্মরোগ, পেটের পীড়া ইত্যাদি এদেশের মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। খাদ্য ও পুষ্টির ঘাটতিজনিত সমস্যা হতে মুক্তি পেতে খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

১। **খাদ্য উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান:** খাদ্য উপাদানসমূহের উৎস, কাজ ও অভাবজনিত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। এ জ্ঞান ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োগ করা গেলে পরিবার হতে দেশ পর্যন্ত - সবাই উপকৃত হবে।

২। **পুষ্টি চাহিদা নির্ণয়:** পুষ্টি চাহিদা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী খাদ্য ব্যবস্থাপনা করা যায়। বয়স, লিঙ্গ, শ্রমের ধরন, শারীরিক অবস্থা, কাজের প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করে পুষ্টি চাহিদা নির্ণয় করা গেলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ফলে যে কোনো ব্যক্তির জন্য যথার্থ পরিমাণের খাদ্য উপাদান সরবরাহ করা যায়।

৩। **খাদ্য নির্বাচনে:** খাদ্য নির্বাচনে পুষ্টি জ্ঞান প্রয়োগ করলে তা ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুস্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ামক হতে পারে।

৪। **রন্ধন পদ্ধতি:** খাদ্য উপাদান বিশেষে সঠিক রন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। এ থেকে কোন ধরনের খাদ্য উপাদান কোন পদ্ধতিতে রন্ধন করলে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে তা জানা যায়। এতে পুষ্টিমূল্যের অপচয় হয় না।

৫। **সাশ্রয়ী মূল্যে সঠিক পুষ্টি:** সাশ্রয়ী মূল্যে সঠিক পুষ্টি পেতে খাদ্য ও পুষ্টিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সহজ লভ্য ও সুলভে, উচ্চ ও অধিক পুষ্টিমানবিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বাছাই করতে এ জ্ঞান কাজে লাগানো যায়।

৬। **মায়ের দুধের পুষ্টিমূল্য:** মায়ের প্রথম শালদুধ ও মায়ের দুধের অমূল্য পুষ্টিগুণ শিশুর জন্য কতটা জরুরি তা খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। শাল দুধ শিশুর জন্য প্রথম টিকা। অর্থাৎ, শাল দুধ শিশু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে এবং মায়ের দুধই শিশুর আদর্শ খাদ্য। এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও প্রচারণা দেশ ও জাতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৭। **সুষম খাদ্য ও মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী:** বিশেষ করে পারিবারিক পরিমন্ডলে সুষম খাদ্য ও মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী সম্পর্কিত জ্ঞান স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৮। **পথ্য সম্পর্কিত জ্ঞান:** খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে পথ্য নির্ভর রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানা যায়। এতে পথ্য নির্ভর রোগ সহজেই উপশম করা যায়।

৯। **রোগ প্রতিরোধ:** বিভিন্ন ধরনের রোগের উৎস ও কারণ নিয়ে পুষ্টি বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় বলে এ জ্ঞান রোগ প্রতিরোধে বিশেষভাবে কাজে আসে।

১০। **কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা প্রতিরোধ:** পুষ্টি, খাদ্য, রোগ, পথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে বলে প্রচলিত কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা প্রতিহত করা যায়। এর ফলে সার্বিক পুষ্টি অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জীবনের জন্য খাদ্য - উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
সারাংশ	

যেসব দ্রব্য আহারের পর দেহে পরিপাক ও শোষণ হয়ে গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে দেহকে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম ও রোগমুক্ত রাখে তাকেই খাদ্য বলে। খাদ্য উপাদান ৬টি যথা: ১। আমিষ, ২। শর্করা, ৩। স্নেহ পদার্থ, ৪। ভিটামিন, ৫। খনিজ লবণ ও ৬। পানি। এসব খাদ্য দেহে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন- ১। দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা, ২। তাপ ও শক্তি উৎপাদন করা, ৩। রোগ প্রতিরোধ করা, ৪। অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহারকৃত খাদ্যদ্রব্য জটিল ও বৃহৎ অণু হতে ভেঙ্গে সরল ও ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয়ে দেহকোষে শোষিত হয় তাকে পুষ্টি বলে। অর্থাৎ, পুষ্টি একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। দেহে খাদ্যের অভাবে পুষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং অপুষ্টি দেখা দেয়। ব্যক্তি ও দেশের জনগণের পুষ্টি তথা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি খাদ্যের কাজ নয়?

ক) গঠন ও বৃদ্ধি সাধন
খ) তাপ ও শক্তি উৎপাদন
গ) রোগ জীবাণু আক্রমণে সাহায্য করা
ঘ) দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করা

২। রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য উপাদান হলো–

i. স্নেহ জাতীয় খাদ্য
ii. ভিটামিন জাতীয় খাদ্য
iii. খনিজ লবণ জাতীয় খাদ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩। পুষ্টি কোন ধরনের প্রক্রিয়া?

ক) জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া
খ) অজৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া
গ) যান্ত্রিক প্রক্রিয়া
ঘ) দৈহিক প্রক্রিয়া

৪। তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য হলো–

i. শর্করা
ii. স্নেহ পদার্থ
iii. ভিটামিন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.২ প্রোটিন বা আমিষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- আমিষের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রোটিন এর শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিডগুলোর নাম বলতে পারবেন;
- আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎস ও কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- প্রোটিন এর অভাবজনিত অবস্থা ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবেন;
- কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় বলতে পারবেন।

দেহ গঠনে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। মানবদেহের মাংসপেশি, অস্থি, রক্ত ইত্যাদি গঠনের প্রধান উপাদান প্রোটিন। দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ তথা জৈব বিক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক বা এনজাইমসমূহ প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এমনকি দেহকোষসমূহ প্রোটিন সমন্বয়ে তৈরি হয়। তাই, খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে প্রোটিন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি।

প্রোটিনের গঠন

প্রোটিনকে ভাঙলে বা সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র বিশ্লেষিত করলে কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) ও নাইট্রোজেন (N) মৌল পাওয়া যায়। কোনো কোনো প্রোটিনে সালফার, ফসফরাস ও লৌহের সামান্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রোটিনের মূল গঠন উপাদান হলো - কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। এ চারটি মৌল মিলিত হয়ে প্রথমে এ্যামাইনো এসিড এবং পরে এ্যামাইনো এসিডগুলো পেপটাইট বন্ধনী দিয়ে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন অণু গঠিত হয়। অর্থাৎ, প্রোটিন হলো এ্যামাইনো এসিডের পলিমার।

প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ

প্রোটিনে এ্যামাইনো এসিড ও অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১। সরল প্রোটিন ২। যৌগিক প্রোটিন ও ৩। উদ্ভুত প্রোটিন।

১। **সরল প্রোটিন:** যেসব প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র এ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায় অর্থাৎ এ্যামাইনো এসিড ছাড়া অন্য কোনো উপাদান পাওয়া যায় না তাদের সরল প্রোটিন বলে। যেমন– এলবুমিন, গ্লোবিউলিন, গ্লুটেনিন, প্রোলামিন, হিস্টোন ইত্যাদি।

২। **যৌগিক প্রোটিন:** যেসব প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে এ্যামাইনো এসিড ছাড়াও অন্যান্য অপ্রোটিন উপাদান পাওয়া যায় তাদের যৌগিক প্রোটিন বলে। যেমন- ফসফোপ্রোটিন, লাইপোপ্রোটিন, নিউক্লিওপ্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন ইত্যাদি। প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত অপ্রোটিন অংশের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ– প্রোটিনের সাথে ফসফেট যুক্ত থাকে বলে ফসফোপ্রোটিন। প্রোটিনের সাথে নিউক্লিয়িক এসিড যুক্ত থাকলে নিউক্লিওপ্রোটিন। এভাবে লিপিড যুক্ত থাকলে লাইপোপ্রোটিন ইত্যাদি। এদের সংযুক্ত প্রোটিনও বলা হয়ে থাকে।

৩। **উদ্ভুত প্রোটিন:** সরল ও যৌগিক প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত প্রোটিনকে উদ্ভুত প্রোটিন বলে। যেমন- পেপটাইডসমূহ, পেপটোন, প্রোটিওজ ইত্যাদি।

প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিডের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১। সম্পূর্ণ প্রোটিন, ২। অসম্পূর্ণ প্রোটিন।

১। **সম্পূর্ণ প্রোটিন:** যে প্রোটিনে সবকটি অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিড থাকে তাকে সম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। এদের পুষ্টিমান উন্নত। যেমন- ডিম ও দুধের প্রোটিন। সাধারণত প্রাণিজ প্রোটিনগুলো সম্পূর্ণ প্রোটিন হয়।

২। **অসম্পূর্ণ প্রোটিনঃ** যে প্রোটিনে এক বা একাধিক অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিডের ঘাটতি থাকে তাকে অসম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। এসব প্রোটিনের পুষ্টিমান নিম্নমানের। যেমন- চাল, গম ও বিচির প্রোটিন। সাধারণত উদ্ভিজ্জ প্রোটিনগুলো অসম্পূর্ণ প্রোটিন হয়।

এ্যামাইনো এসিড

বহু সংখ্যক এ্যামাইনো এসিড পরস্পর পেপটাইড বন্ধনী দিযে যুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠিত হয়। প্রকৃতিতে প্রায় ২০/২২ ধরনের এ্যামাইনো এসিড আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এ্যামাইনো এসিড আমাদের দেহেই তৈরি হয়।

অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিডঃ কতগুলো এ্যামাইনো এসিড আমাদের দেহ তৈরি করতে পারে না। অথচ এগুলো দেহের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই এদের খাদ্যের মাধ্যমে দেহে সরবরাহ করতে হয়। এদেরকে অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিড বলে। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৮টি এবং শিশুদের জন্য ১০টি অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিড খাদ্যের মাধ্যমে দেহে যোগান দিতে হয়। এগুলো হলো–

১। মিথিওনিন (Methionine)
২। আইসোলিউসিন (Isoleucine)
৩। লিউসিন (Leucine)
৪। ফিনাইল এলানিন (Phenylalanine)
৫। থ্রিওনিন (Threonine)
৬। ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan)
৭। লাইসিন (Lysine)
৮। ভ্যালিন (Valine)
৯। হিস্টিডিন (Histidine) - শুধুমাত্র শিশুদের জন্য
১০। আরজিনিন (Arginine)- শুধুমাত্র শিশুদের জন্য

অনাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিডঃ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় যেসব এ্যামাইনো এসিড দেহেই তৈরি হতে পারে তাদের অনাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিড বলে। যেমন- গ্লাইসিন, এলানিন, এসপারটিক এসিড, সেরিন, গ্লুটামিক এসিড ইত্যাদি।

প্রোটিনের কাজঃ গ্রিক শব্দ প্রোটিওস থেকে প্রোটিন শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ হলো- প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ। মানবদেহের প্রধান গঠন উপাদানই হলো- প্রোটিন। দেহে প্রোটিনের কাজ ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–

১। প্রোটিনের প্রধান কাজ হলো দেহ গঠন, বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করা। মানবদেহের পেশি, অস্থি, রক্তের হিমোগ্লোবিনের অন্যতম প্রধান গঠন উপাদান হলো প্রোটিন। এছাড়া, দাঁত, নখ, চুল প্রভৃতির অন্যতম গঠন উপাদান প্রোটিন।
২। হরমোন ও এনজাইমসমূহ প্রোটিন দিয়ে তৈরি, যা দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করে।
৩। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে প্রোটিন দেহে জীবাণু ধ্বংসকারী অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন তৈরি করে।
৪। দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত শর্করা ও স্নেহ পদার্থের অভাব হলে প্রোটিন ভেঙ্গে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।
৫। প্রোটিন দেহে পানির সমতা বজায় রাখে।
৬। প্রোটিন রক্তের অম্ল ও ক্ষারের সমতা নিয়ন্ত্রণ করে।
৭। খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জারক রস, যেমন- পেপসিন, ট্রিপসিন ইত্যাদি প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়।
৮। দেহের ক্ষতস্থান হতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে প্রোটিন দিয়ে তৈরি ফিব্রিন কাজ করে।
৯। ত্বক ও চুলের স্বাভাবিক রং বজায় রাখতে প্রোটিন সাহায্য করে।
১০। শিশুর মানসিক বিকাশে প্রোটিন সাহায্য করে।

প্রোটিনের উৎসঃ উৎস অনুসারে প্রোটিন ২ প্রকার। যথা: ১। প্রাণিজ প্রোটিন ও ২। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

১। **প্রাণিজ প্রোটিনঃ** প্রাণি থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনসমূহকে প্রাণিজ প্রোটিন বলে। যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির ছানা, কলিজা ইত্যাদি। প্রাণিজ প্রোটিনে সবকটি অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিড থাকে বলে এদের গুণগত মান উন্নত। এদের সম্পূর্ণ প্রোটিনও বলা হয়।
২। **উদ্ভিজ্জ প্রোটিনঃ** উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলে। যেমন- সব ধরনের ডাল, সব ধরনের বাদাম, সয়াবিন, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, কাঁঠালের বিচি, সবজির বিচি ইত্যাদি। উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত প্রোটিনের গুণগত মান উন্নত নয়। কারণ এতে এক বা একাধিক অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিডের ঘাটতি থাকে।

প্রোটিনের অভাবজনিত অবস্থা

১। প্রোটিনের অভাবে শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ওজন হ্রাস পায় ও দেহ খর্বকায় (উচ্চতা কম) হয়।
২। এনজাইম নিঃসরণ বাধাগ্রস্থ হয় বলে পরিপাক ও শোষণ ব্যাহত হয়।
৩। রক্তের হিমোগ্লোবিনের অভাবে রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়া হয়।
৪। শিশুদের মেজাজ খিটখিটে হয়।
৫। ত্বক বা চামড়া খসখসে হয়।
৬। চুলের রং পরিবর্তন হয়ে লালচে বাদামি হয়ে যায়।
৭। যকৃতের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়ে স্থানে স্থানে চর্বি জমে যায়।
৮। শরীরে পানি জমে বা ইডিমা হয়।
৯। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
১০। শিশুদের কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস নামক রোগ হয়।

প্রোটিন ও প্রোটিন-ক্যালরি অভাবজনিত রোগ

প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবে বিশেষত শিশুদের মধ্যে যে ধরনের অপুষ্টি দেখা যায় তাকে প্রোটিন-শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি বা Protein Energy Malnutrition (PEM) বা PCM (Protein Calorie Malnutrition) বলা হয়। মারাত্মক মাত্রায় প্রোটিন ও প্রোটিন-ক্যালরির অভাবে শিশুদের মধ্যে কোয়াশিওরকর (গা ফোলা) ও ম্যারাসমাস (হাড্ডিসার) রোগ হয়। নিচে এ দুটি রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

কোয়াশিওরকর (Kwashiorkor): শৈশবে মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত ও পরবর্তীতে খাবারে প্রোটিনের অভাব (Protein Deficiency) ঘটলে কোয়াশিওরকর রোগ হতে পারে। এ রোগের লক্ষণগুলো হলো–

১। সাধারণত ১-৬ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।
২। শিশুর ওজন কমে যায় ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তবে ওজন বয়সের তুলনায় ৬০ ভাগের উপরে থাকে।
৩। হাত, পা ও মুখে পানি জমে।
৪। মাংসপেশি শীর্ণ হয়। কিন্তু পানি জমার কারণে শীর্ণকায় অবস্থাটি অনেক সময় বোঝা যায় না।
৫। ত্বকের বহিরাবরণ পাতলা দেখায়। অনেক সময় ত্বক ফেটে যেয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়
৬। মুখাবয়ব গোলাকার চাঁদের মত দেখায়। একে (moonface) বলে।
৭। মাথার চুলের রং পরিবর্তিত হয়ে বাদামি হয়ে যায় এবং চুল পড়ে পাতলা হয়ে যায়।
৮। যকৃতের আকার বৃদ্ধি পায়।
৯। সাধারণত ক্ষুধামন্দা বা অরুচি দেখা দেয়।
১০। শিশু উদাসীন থাকে এবং কোনো ব্যাপারে উৎসাহ থাকে না।

চিত্র: ৯.২.১: কোয়াশিওরকর আক্রান্ত শিশু

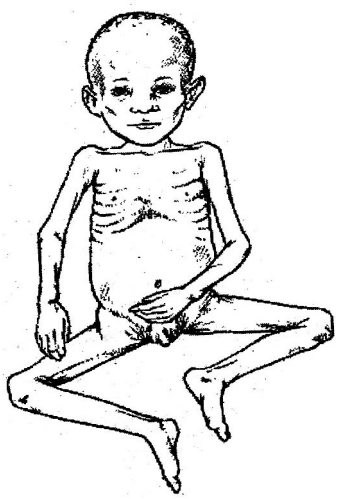

চিত্র: ৯.২.২: ম্যারাসমাস আক্রান্ত শিশু (হাড্ডিসার)

ম্যারাসমাস (Marasmus): খাদ্যে প্রোটিনের সাথে সাথে ক্যালরির তীব্র অভাব (Protein - Calorie Deficiency) হলে ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার রোগ হতে পারে। এ রোগের লক্ষণগুলো হলো–

১। প্রধানত ১/২ বছর বয়সী শিশুদের এ রোগ বেশি হয়।

২। শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ওজন বয়সের তুলনার ৬০ ভাগের নিচে নেমে আসে।

৩। হাত পা সরু ও পেট অনেক বড় দেখায়।

৪। মাংসপেশি শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায়।

৫। ত্বক বা চামড়া ঢিলা হয়ে যায় ও কুঁচকে যায়।

৬। মুখাবয়ব চিন্তাক্লিষ্ট বৃদ্ধের মতো (Mankey like face) দেখায়।

৭। চুলের রং বদলে যায় ও চুল পড়ে যায়।

৮। শিশুর মধ্যে রক্তস্বল্পতা দেখা যায়। সাধারণত ক্ষুধার্ত থাকে ও ঘন ঘন ক্ষুধা পায়।

৯। শিশু সাধারণত অস্থির থাকে।

চিত্র: ৯.২.৩: একটি কোয়াশিওরকর আক্রান্ত শিশু

চিত্র: ৯.২.৪: একটি ম্যারাসমাস আক্রান্ত শিশু

কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস প্রতিরোধ

১। শিশুকে অবশ্যই শাল দুধসহ পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ দিতে হবে।

২। পাঁচ মাস বয়সের পর হতে মায়ের দুধের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পরিপূরক খাবার শিশুকে দিতে হবে।

৩। শিশু বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলে দ্রুত রোগ নিরাময় করতে হবে ও ঘাটতি পূরণে বিশেষ করে প্রোটিন ও ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

৪। নিয়মিত শিশুর ওজন, উচ্চতা ইত্যাদি মাপ নিয়ে বৃদ্ধির গতি স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

৫। শিশুর মা-বাবাকে পরিবারের আকার ছোট রাখতে হবে এবং দুটি সন্তানের মধ্যে অন্তত ৩-৫ বছরের ব্যবধান দিতে হবে।

৬। খাবারে প্রাণিজ প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকা ভালো।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস রোগের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

সারাংশ

মানবদেহের মাংসপেশি, অস্থি, রক্ত, এনজাইম, হরমোন, চুল, ত্বক, নখ ইত্যাদি গঠনের প্রধান বা অন্যতম প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। প্রোটিনকে সম্পূর্ণভাবে আর্দ্র বিশ্লেষিত করলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এ চারটি মৌল মিলিত হয়ে তৈরি হয় এ্যামাইনো এসিড। বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো এ্যামাইনো এসিড পেপটাইড বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে প্রোটিন অণু গঠন করে। প্রোটিন একটি জটিল জৈব উপাদান যা মূলত এ্যামাইনো এসিডের পলিমার। প্রোটিনে এ্যামাইনো এসিড ও অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ১। সরল প্রোটিন, ২। যৌগিক প্রোটিন ও ৩। উদ্ভুত প্রোটিন। অত্যাঅবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিডের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রোটিন দুই প্রকার। যথা: ১। সম্পূর্ণ প্রোটিন, ২। অসম্পূর্ণ প্রোটিন। অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিডগুলো হলো– আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মিথিওনিন, থ্রিওনিন, ট্রিপটোফ্যান, ভ্যালিন, ফিনাইল এলানিন। প্রোটিনের প্রধান প্রধান কাজগুলো হলো- দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ, রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠন, এনজাইম ও হরমোন গঠন, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি, দেহে পানির সমতা বজায় রাখা, রক্তের ক্ষারত্ব ও অম্লত্ব নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। উৎস অনুসারে প্রোটিন ২ প্রকার। যথা: প্রাণিজ প্রোটিন ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। প্রাণিজ প্রোটিনের গুণগত মান উন্নত অন্যদিকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পুষ্টিমান ততটা উন্নত নয়। প্রোটিনের অভাবে দেহে বিভিন্ন অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশুদের মধ্যে মারাত্মক প্রোটিন এর অভাবে কোয়াশিওরকর এবং প্রোটিন-ক্যালরির অভাবে ম্যারাসমাস রোগ দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রোটিন ভাঙলে কোন কোন মৌল পাওয়া যায়?
ক) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন খ) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
গ) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও ক্লোরিন ঘ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন

২। দেহে প্রোটিনের কাজ হলো–
i. পেশি গঠন করা
ii. অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন তৈরি করা
iii. দেহে পানির সমতা রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। কোন খাদ্যগুলোতে প্রোটিনের গুণগত মান উন্নত?
ক) দুধ ও কাঁঠালের বিচি খ) বাদাম ও ডাল
গ) দুধ ও ডিম ঘ) মাছ ও মটরশুঁটি

৪। কোয়াশিওরকর বা গা ফোলা রোগের লক্ষণ হলো–
i. হাত, পা ও মুখে পানি জমে
ii. মুখাবয়ব চিন্তাক্লিষ্ট বৃদ্ধের মতো দেখায়
iii. যকৃতের আকার বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৩ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের গঠন উপাদান উল্লেখ করতে পারবেন;
- শর্করার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- শর্করা জাতীয় খাদ্যের উৎস ও কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- দেহে অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যতম প্রধান খাদ্য বা প্রধান পুষ্টি উপাদান। দেহের শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য উপাদানের মধ্যে শর্করা অপরিহার্য। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন খাদ্যসমূহের বেশিরভাগই শর্করা জাতীয় খাদ্য। আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি ও তাপশক্তির ৬০%-৭০% শক্তি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হতে গ্রহণ করা হয়। ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা হতে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

গঠন

কার্বোহাইড্রেটের মূল গঠন উপাদান হলো- কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O)। কার্বোহাইড্রেট অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ঃ১ অনুপাতে অবস্থান করে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত জৈব যৌগের মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের সংখ্যাই বেশি।

শর্করার শ্রেণিবিভাগ

গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শর্করাকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১। এক-শর্করা (Monosaccharide), ২। দ্বি-শর্করা (Disaccharide), ৩। বহু-শর্করা (Polysaccharide)।

১। **এক-শর্করা** (Monosaccharide)**ঃ** Mono অর্থ এক এবং Saccharide অর্থ চিনি। এ থেকেই Mono Saccharide বা এক-শর্করার নামকরণ করা হয়েছে। এক অণুবিশিষ্ট সরল শর্করাকে এক-শর্করা বলা হয়। মনোস্যাকারাইডকে বিশ্লেষণ করলে কেবল কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রক্টোজ ও গ্যালাক্টোজ।

২। **দ্বি-শর্করা** (Disaccharide)**ঃ** ডাই অর্থ দুই। দুটি এক-শর্করার অণু যুক্ত হয়ে দ্বি-শর্করা তৈরি হয়। দ্বি-শর্করাকে বিশ্লেষণ করলে ২টি এক-শর্করা পাওয়া যায়। যেমন- সুক্রোজ, মল্টোজ ও ল্যাকটোজ।
এদের বিশ্লেষণ করলে ২টি করে এক-শর্করা পাওয়া যাবে।

সুক্রোজ $\rightarrow$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

মল্টোজ $\rightarrow$ গ্লুকোজ + গ্লুকোজ

ল্যাকটোজ $\rightarrow$ গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ

৩। **বহু শর্করা (Poly Saccharide)ঃ** বহু শর্করাগুলো জটিল শর্করা। অনেকগুলো বা দুই এর অধিক। এক-শর্করা অণু যুক্ত হয়ে বহু শর্করা গঠিত হয়। যেমন- সেলুলোজ, স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন। এদের ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করলে এক শর্করা পাওয়া যায়।

শর্করার উৎস

অন্যান্য খাদ্য উপাদানের তুলনায় প্রকৃতিতে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শস্যদানা, যেমন- চাল, গম, আলু, চিনি, মধু, গুড়, মিষ্টি ফল, ফলের রস, দুধ, অঙ্কুরিত বীজ, কলা, আঙ্গুর, কাঁঠাল এবং প্রাণিদেহের মাংসপেশির গ্লাইকোজেন, যকৃত ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শর্করা পাওয়া যায়।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ, নাম ও খাদ্য উৎস

শর্করার শ্রেণিবিভাগ	বিভিন্ন প্রকার শর্করার নাম	খাদ্য উৎস
এক-শর্করা	গ্লুকোজ	চিনি, মিষ্টি, ফল, গুড়
	ফ্রুকটোজ	ফলের রস, মধু, চিনি
	গ্যালাকটোজ	দুধের শর্করা ল্যাকটোজ
দ্বি-শর্করা	সুক্রোজ	চিনি, মিষ্টি ফল, অঙ্কুরিত বীজ
	মলটোজ	দুধ, মগজ
	ল্যাকটোজ	দুধ
বহু-শর্করা	স্টার্চ	শস্যদানা যেমন- চাল, গম, আলু, কলা
	সেলুলোজ	খোসা, ছাল, বিচি, শাক, ডাঁটা
	গ্লাইকোজেন	প্রাণির মাংসপেশি ও যকৃত

শর্করার কাজ

১। কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন করা। প্রতি ১ গ্রাম শর্করা হতে ৪ কিলোক্যালরি তাপ ও শক্তি পাওয়া যায়। শক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ উৎস শর্করা।

২। প্রোটিন ভেঙ্গে তাপ উৎপাদন হওয়া রোধ করে। এতে প্রোটিন রক্ষিত হয়।

৩। স্নেহ পদার্থের দহনে সাহায্য করে আমাদের কিটোসিস রোগ হতে রক্ষা করে।

৪। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শর্করা গ্লাইকোজেনরূপে পেশি ও যকৃতে জমা থাকে যা প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

৫। সেলুলোজ, পেকটিন ইত্যাদি জটিল শর্করা বা বহু-শর্করাগুলো কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।

৬। মস্তিষ্কের শক্তি সরবরাহের জন্য শর্করা জ্বালানি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

অভাবজনিত অবস্থা

১। কার্বোহাইড্রেটের অভাবে দেহের ওজন কমে যায়।

২। শর্করা হতে শক্তি উৎপাদন হতে না পারলে কর্মশক্তি হ্রাস পায়।

৩। স্নেহ পদার্থ হতে তাপ ও শক্তি উৎপাদনে শর্করা সাহায্য করে।

৪। শর্করার অভাবে চর্বি জাতীয় পদার্থের দহন বিঘ্নিত হয়। ফলে কিটোসিস নামক রোগ সৃষ্টি হয়।

অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের কুফল

১। অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণ করলে তা দেহে মেদরূপে জমা হয় ও ওজন বৃদ্ধি পায়।

২। অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের ফলে স্থূলতা দেখা দেয়।

৩। অতিরিক্ত শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ দাঁত ক্ষয়ের অন্যতম কারণ।

৪। অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণ ডায়বেটিস রোগের অন্যতম কারণ হতে পারে।

চাহিদা

দেহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির ৬০%-৭০% কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হতে গ্রহণ করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	দেহে শর্করার কাজ ও অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের কুফলের তালিকা করুন।

সারাংশ

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের জটিল জৈব যৌগ যা উদ্ভিজ্জ

ও প্রাণিজ খাদ্যে পাওয়া যায়। শর্করাকে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা: ১। এক-শর্করা, ২। দ্বি-শর্করা ও ৩। বহু-শর্করা। এক-শর্করাগুলো হলো - গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ, দ্বি-শর্করাগুলো হলো- সুক্রোজ, মলটোজ, ল্যাকটোজ। বহু-শর্করাগুলো হলো- স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন। শস্যদানা যেমন- চাল, গম, ভুট্টা, যব, চিড়া, মুড়ি। চিনি, মধু, গুড়, মিষ্টি ফল, ফলের রস, আম, কাঁঠাল, আঙ্গুর, কলা, দুধ, মগজ, আলু, বিচি, খোসা, ছাল, শাক, ডাঁটা ইত্যাদি শর্করার ভালো উৎস। মানুষের দৈনিক শক্তি চাহিদার ৬০-৭০% শক্তি শর্করা জাতীয় খাদ্য হতে আসে। শর্করার অভাবে ওজন হ্রাস ও কর্মশক্তি হ্রাস পায়। এছাড়া এর অভাবে স্নেহের দহন ব্যাহত হয়ে কিটোসিস নামক রোগ হতে পারে। মস্তিষ্কের জন্য শক্তি সরবরাহের অপরিহার্য উৎস হলো শর্করা। অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের ফলে স্থূলতা, ডায়বেটিস, হৃদরোগ ইত্যাদি হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির কত শতাংশ শর্করা জাতীয় খাদ্য হতে পাওয়া যায়?

ক) ৪০%-৫০% খ) ৫০%-৬০%

গ) ৬০%-৭০% ঘ) ৭০০%-৮০%

২। শর্করার গঠন উপাদান কোনটি?

ক) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন খ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন

গ) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ঘ) কার্বন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

৩। দ্বি-শর্করাকে ভাঙলে কী পাওয়া যায়?

ক) অনেকগুলো এক-শর্করা খ) দুইটি এক-শর্করা

গ) একটি এক-শর্করা ও গ্লাইকোজেন ঘ) স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন

৪। বহু শর্করাগুলো হলো–

i. ল্যাকটোজ

ii. সেলুলোজ

iii. স্টার্চ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। মলটোজ বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?

ক) গ্লুকোজ+গ্লুকোজ খ) গ্লুকোজ+ফ্রুকটোজ

গ) গ্লুকোজ+গ্যালাকটোজ ঘ) ফ্রুকটোজ+গ্যালাকটোজ

৬। শর্করার কাজ হলো-

i. তাপ ও শক্তি উৎপাদন করা

ii. কিটোসিস প্রতিরোধ করা

iii. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৪ ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফ্যাটের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের উৎস বলতে পারবেন;
- স্নেহ পদার্থের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফ্যাটের অভাবজনিত অবস্থা বলতে পারবেন;
- অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রধান খাদ্য উপাদান তিনটির মধ্যে ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ অন্যতম। মূলত তেল (oil) ও চর্বিকে (fat) একত্রে স্নেহ পদার্থ বলা হয়। অনেক সময় তেল ও চর্বিকে লিপিডও (Lipid) বলা হয়। উদ্ভিজ্জ উৎস হতে প্রাপ্ত ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থগুলো তেল (oil) এবং প্রাণিজ উৎস হতে প্রাপ্ত ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থগুলো চর্বি (fat) বলা হয়। স্নেহ পদার্থ হতে সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। ১ গ্রাম ফ্যাট হতে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

ফ্যাটের গঠন

১ অণু গ্লিসেরলের সাথে ৩ অণু ফ্যাটি এসিড যুক্ত হয়ে ফ্যাটের অণু গঠিত হয়। গ্লিসেরল হলো এক প্রকার এ্যালকোহল এবং ফ্যাটি এসিড হলো এক প্রকার জৈব এসিড। ফ্যাটের বিশ্লেষণে কার্বন (c), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (o) পাওয়া যায়।

ফ্যাটের শ্রেণিবিভাগ

গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ফ্যাটকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা: ১। সরল ফ্যাট, ২। যৌগিক ফ্যাট ও ৩। উদ্ভুত ফ্যাট।

১। **সরল ফ্যাট (Simple fat):** যেসব স্নেহ পদার্থ ভাঙলে কেবল গ্লিসেরল ও ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায় তাকে সরল ফ্যাট বলে। ত্বকের নিচে, যকৃত ও মেদকলায় সরল ফ্যাট থাকে।

২। **যৌগিক ফ্যাট (Compound fat):** যেসব ফ্যাট বিশ্লেষণ করলে গ্লিসেরল ও ফ্যাটি এসিড ছাড়াও অন্যান্য উপাদান যেমন- ফসফরাস, শর্করা, প্রোটিন ইত্যাদি পাওয়া যায় তাদের যৌগিক ফ্যাট বলে। ফসফোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড, লাইপোপ্রোটিন ইত্যাদি যৌগিক ফ্যাট। ফসফরাস যুক্ত ফ্যাট হলো ফসফোলিপিড, শর্করা যুক্ত ফ্যাট গ্লাইকোলিপিড, প্রোটিনযুক্ত ফ্যাট লাইপোপ্রোটিন ইত্যাদি। মানবদেহের কোষ ঝিল্লী, মগজ ইত্যাদিতে যৌগিক ফ্যাট পাওয়া যায়।

৩। **উদ্ভুত ফ্যাট (Derived fat):** সরল ও যৌগিক ফ্যাট হতে উৎপন্ন কিছু জটিল চক্রাকার আকৃতির উপাদানসমূহকে উদ্ভুত ফ্যাট বলা হয়। যেমন- কোলেস্টেরল। কোষ ঝিল্লীর প্রধান গঠন উপাদান কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরল হতে কোনো শক্তি উৎপন্ন হয় না।

ফ্যাটি এসিড

স্নেহ পদার্থের প্রধান অংশ ফ্যাটি এসিড। ফ্যাটি এসিডের প্রকৃতির উপর ফ্যাটের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। প্রকৃতিতে প্রায় ৪০ প্রকারের ফ্যাটি এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। ফ্যাটি এসিড একটি জৈব এসিড যাতে ৪-১৪ টি কার্বন থাকে। ফ্যাটি এসিড ২ ধরনের হয়ে থাকে ১। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড এবং ২। সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড।

১। **অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (Unsaturated fatty acid):** যেসব ফ্যাটি এসিডের কার্বন অণুতে আরও হাইড্রোজেন অণু যুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে তাদের অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বলে। সামুদ্রিক মাছের তেলে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে। যেমন- কড মাছের তেল।

২। **সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (Saturated fatty acid):** যেসব ফ্যাটি এসিডের কার্বন অণু পরিপূর্ণভাবে হাইড্রোজেন দিয়ে সম্পৃক্ত থাকে, আর কোনো হাইড্রোজেন গ্রহণের সুযোগ থাকে না তাদের সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বলে। যেমন- চর্বি, মাখন, ডালডা ইত্যাদি।

অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড (Essential fatty acid): যেসব ফ্যাটি এসিড দেহে তৈরি হতে পারে না অথচ এদের দেহের যথেষ্ট পুষ্টিগত গুরুত্ব আছে এবং এদের অভাবে দেহের কার্যাবলি বিঘ্নিত হয় তাদের অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড বলে। অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড ৩টি। এগুলো হলো-

১। **লিনোলেইক এসিড (Linoleic acid):** ডিমের কুসুম, বাদাম, সয়াবিন তেলে পাওয়া যায়।

২। **লিনোলিনিক এসিড (Linolenic acid):** মাছের তেল, যকৃতে পাওয়া যায়।

৩। **এ্যারাকিডনিক এসিড (Arachidonic acid):** যকৃতের তেলে পাওয়া যায়।

ফ্যাটের উৎস: ফ্যাট প্রাণি এবং উদ্ভিদ উভয় ধরনের উৎস থেকেই পাওয়া যায়।
প্রাণিজ উৎস: মাংস ও বড় মাছের চর্বি, ঘি, মাখন, ডিমের কুসুম, দুধের সর, যকৃত, মগজ ইত্যাদি।
উদ্ভিজ্জ উৎস: সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, বাদাম তেল, চীনা বাদাম, কাজু বাদাম, বীজ তেল ইত্যাদি।

ফ্যাট বা স্নেহের কাজ

১। ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থের প্রধান কাজ-দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা। প্রোটিন ও শর্করার তুলনায় ফ্যাট হতে সর্বাধিক শক্তি পাওয়া যায়। ১ গ্রাম ফ্যাট হতে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।
২। ফ্যাট ত্বকের মসৃণতা, সৌন্দর্য ও চাকচিক্য বজায় রাখে।
৩। চর্মরোগ হতে রক্ষা পেতে ফ্যাট কাজ করে।
৪। ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ, যথা- ভিটামিন- এ, ডি, ই এবং কে দেহে শোষণের জন্য স্নেহপদার্থের উপস্থিতি অপরিহার্য।
৫। দেহে শক্তির অভাব ঘটলে সঞ্চিত ফ্যাট ভেঙ্গে শক্তি উৎপন্ন হয়।
৬। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, কিডনি, লিভার ইত্যাদিকে ফ্যাট কুশনের মতো নিরাপদে রাখে ও আঘাত হতে রক্ষা করে।

অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড বা স্নেহপদার্থের অভাবজনিত অবস্থা

১। ফ্যাটের অভাবে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো দেহে শোষিত হতে পারে না।
২। ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে যায়।
৩। দেহের সৌন্দর্য হানি হয়।
৪। অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের অভাবে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ দেখা দেয়।
৫। শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও একজিমা দেখা দিতে পারে।

অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের কুফল

১। দেহে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও শরীর মেদবহুল হয়।
২। ওজনাধিক্য বা স্থূলতা (obesity) হয়।
৩। হৃদরোগসহ অন্যান্য জটিল রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে।

চাহিদা

দেহের জন্য প্রয়োজনীয় মোট ক্যালরির ২০%-৩০% শক্তি ফ্যাট জাতীয় খাদ্য হতে গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত স্নেহ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে অবশ্যই অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে শ্রেণিবিভাগ করে দেখান।

সারাংশ

ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থকে অনেক সময় লিপিড (Lipid) বলা হয়। ১ গ্রাম ফ্যাট হতে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। ১ অণু গ্লিসেরলের সাথে ৩ অণু ফ্যাটি এসিড যুক্ত হয়ে ফ্যাটের অণু গঠিত হয়। ফ্যাট এক প্রকার জৈব এসিড যা বিশ্লেষণ করলে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ফ্যাট তিন প্রকার। যথা- ১। সরল ফ্যাট, ২। যৌগিক ফ্যাট ও ৩। উদ্ভুত ফ্যাট। ফ্যাটে অবস্থিত ফ্যাটি এসিডের সম্পৃক্ততার উপর নির্ভর করে ফ্যাটি এসিডকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা- ১। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও ২। সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। যেসব ফ্যাটি এসিড দেহে তৈরি হতে পারে না অথচ দেহে এদের অভাবে বিভিন্ন কার্যাবলি বিঘ্নিত হয় তাদের অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড বলে। এগুলো হলো- লিনোলেইক এসিড, লিনোলিনিক এসিড এবং এ্যারকিডনিক এসিড। প্রকৃতিতে ফ্যাটের প্রাণিজ উৎস এবং উদ্ভিজ্জ উৎস আছে। ফ্যাটের প্রধান কাজগুলো হলো- তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা, ত্বকের মসৃণতা, চাকচিক্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখা, চর্মরোগ প্রতিরোধ করা, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ শোষণে সাহায্য করা, শিশুদের বৃদ্ধিতে ও একজিমা রোধে সহায়তা করা ইত্যাদি। অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের ফলে ওজনাধিক্য, স্থূলতা, হৃদরোগ ইত্যাদি হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কীভাবে ফ্যাটের অণু গঠিত হয়?
- ক) ৩ অণু গ্লিসেরলের সাথে ৩ অণু ফ্যাটি এসিড যুক্ত হয়ে
- খ) ১ অণু গ্লিসেরলের সাথে ৩ অণু ফ্যাটি এসিড যুক্ত হয়ে
- গ) ৩ অণু গ্লিসেরলের সাথে ১ অণু ফ্যাটি এসিড যুক্ত হয়ে
- ঘ) ১ অণু গ্লিসেরলের সাথে ১ অণু ফ্যাটি এসিড যুক্ত হয়ে

২। ফ্যাট বিশ্লেষণ করলে কী কী পাওয়া যায়?
- ক) কার্বন ও হাইড্রোজেন
- খ) হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন
- গ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন
- ঘ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন

৩। অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড হলো–
- i. লিনোলেইক এসিড
- ii. লিনোলিনিক এসিড
- iii. এ্যারাকিডনিক এসিড

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৪। স্নেহ পদার্থের কাজ হলো-
- i. পেশি গঠন করা
- ii. ত্বকের মসৃণতা ও চাকচিক্য রক্ষা করা
- iii. শিশুদের একজিমা রোধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সুমন ও সিগ্ধা পিঠেপিঠি ভাইবোন। দু'জনের বয়সের পার্থক্য ১৪ মাস। বয়স ২ বছর পেরোতেই সুমনের নানারকম অসুস্থতা দেখা দিল। শীর্ণ দেহ, মোটা পেট, ফোলা মুখমন্ডল, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার রোগ শনাক্ত করে পরামর্শপত্র লিখে দিলেন।

ক) প্রধান খাদ্য উপাদানগুলো কী কী?
খ) শিশুদের জন্য কোন দু'টি এ্যামাইনো এসিড অত্যাবশ্যকীয়?
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশু সুমন কোন রোগে আক্রান্ত - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) সুমনের এ রোগ হওয়ার কারণ কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন - আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পুষ্টি প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
২। শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিডগুলোর নাম লিখুন।
৩। দেহে প্রোটিনের কাজের তালিকা করুন।
৪। প্রোটিনের অভাবজনিত অবস্থার বর্ণনা দিন।
৫। অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের কুফল কী?
৬। অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডগুলো কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস রোগের তুলনামূলক আলোচনা করুন।
২। শর্করার শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। খ